সন্তুরবাদক পণ্ডিত শিবকুমার শর্মার জন্ম ১৯৩৮ সালে জম্মুতে সম্ভ্রান্ত সংগীত পরিবারে। মাতৃভাষা ডোগরি। প্রথিতযশা শিল্পী বাবা উমা দত্ত শর্মার কাছে সংগীত, তবলায় প্রশিক্ষণ মাত্র ৫ বছর বয়সে। সন্তুরের ওপর প্রশিক্ষণ ১৩ বছর বয়সে। মঞ্চে প্রথম সন্তুর বাজান বম্বেতে (বর্তমান মুম্বই) ১৯৫৫ সালে। শান্তারামের 'ঝনক ঝনক পায়েল বাজে' (১৯৫৬ সাল) ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক তাঁর করা। 'সিলসিলা' সহ বহু হিন্দি ছবিতে হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়ার সঙ্গে সুরারোপ করেছেন তিনি। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণে সম্মানিত শিবকুমারের সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার অর্জন ১৯৮৬-তে। বালটিমোরের সাম্মানিক নাগরিকত্ব অর্জন ১৯৮৫ সালে।

বুধবার, ২৮ পৌষ ১৪২৭ ■ ৪১ বর্ষ ■ ২৩৫ সংখ্যা

পর্যটনে ঘোর বিপদ

করোনাকালে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসাগুলির তালিকায় রয়েছে পর্যটন। দীর্ঘ লকডাউন তো বটেই, তারপরেও লম্বা সময় ধরে পর্যটনে নানা নিষেধাজ্ঞা ছিল। ভ্রমণপিপাসু মানুষ ঘরে হাঁপিয়ে উঠলেও ভয়-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বেড়াতে যেতে পারেননি। ফলে পর্যটন ব্যবসায় জড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষ দীর্ঘদিন জীবিকার গভীর সংকটে সময় কাটিয়েছেন। কেউ কেউ পাকাপাকিভাবে এই ব্যবসা থেকে সরেও গিয়েছেন এই সময়ে। ব্যবসাদার, টুর অপারেটরদের পাশাপাশি চরম ক্ষতি হয়েছে গাড়িচালক, শ্রমিক, রিসর্ট-লজ-হোটেলকর্মীদের। এঁদের সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। উত্তরবঙ্গে এই ক্ষতির প্রভাব মারাত্মক। এই এলাকায় চা শিল্প বাদ দিলে ব্যবসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান আছে পর্যটনেই। এই বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে প্রচুর মানুষ জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। সেই বাণিজ্যে ঘাটতি যেমন সার্বিকভাবে স্থানীয় অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে, তেমনই এর সঙ্গে যুক্তদের জীবনে দুঃসময় নেমে আসে।

ভয়াবহ সেই দুঃসময় কাটিয়ে গত বছরের দুর্গাপুজোর পর থেকে পর্যটন ব্যবসা আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। উত্তরবঙ্গেও ধীরে ধীরে পর্যটন ব্যবসায় প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিল। বিদেশের লোকজন এখনও তেমনভাবে আসতে পারছেন না ঠিকই, কিন্তু দেশের ভ্রমণপিপাসুরা আবার উত্তরবঙ্গমুখী হতে শুরু করেছেন। পাহাড়, ডুয়ার্স-তরাই, কোচবিহার, মালদা-দক্ষিণ দিনাজপুরে আবার পর্যটকের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। এ সময় কার্যত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো জঙ্গল এলাকার পর্যটনে তালা পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গে পর্যটনের প্রধান আকর্ষণই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও বন্যপ্রাণ। নয়নশোভন ও জীববৈচিত্র্যপূর্ণ এই বনভূমি ও বন্যপ্রাণের আকর্ষণে শুধু দেশ নয়, বিদেশের লক্ষ লক্ষ পর্যটক প্রতিবছর ছুটে আসেন তিস্তা-মহানন্দা-তোর্ষা-কালজানি বিধৌত বঙ্গের এই উত্তরভাগে।

বন দপ্তরে নিয়োগ কেন্দ্র করে অশান্তির আঁচেই পর্যটন সম্ভাবনা আবার ব্যাহত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, সম্প্রতি বন সহায়ক পদে নিয়োগ নিয়ে চরম দুর্নীতি হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা যার ফলে বঞ্চিত হয়েছেন চাকরির সুযোগ থেকে। অন্যদিকে, অসাধু উপায়ে যোগ্যতামানে ঘাটতি থাকলেও অনেকের কর্মসংস্থান হয়ে গিয়েছে। দেশে তো বটেই, নির্দিষ্টভাবে বাংলায় এখন কর্মসংস্থানের সমস্যা শিখর ছুঁয়েছে। লকডাউন সেই সমস্যাকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সুযোগ হাতছাড়া হলে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। বন দপ্তরের নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। কিন্তু এই নিয়োগের ফলে অসন্তোষ ধূমায়িত হওয়ার ঘটনা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে তদন্ত হবে কি না, তা স্পষ্ট নয় এখনও। রাজ্য সরকারের উচিত, এ বিষয়ে অবস্থান স্পষ্ট করা। কেননা বন দপ্তর রাজ্য সরকারের অধীন, সেই দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগের দায় সার্বিকভাবে সরকার এড়াতে পারে না। তার ওপর এনিয়ে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের বিক্ষোভে বন দপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ে তালা পড়ায় দপ্তরের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হওয়ায় কার্যত লাটে উঠতে চলেছে পর্যটন ব্যবসা। জঙ্গলে সাফারি বন্ধ হয়ে গিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, কোচবিহার বন বিভাগের একাংশ, এমনকি জলপাইগুড়ি জেলার মোরাঘাট বনাঞ্চলে। অথচ এই সাফারিগুলি পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। জঙ্গল ভ্রমণের এই সুযোগ নেওয়ার আগ্রহ এ অঞ্চলে বেড়াতে আসা প্রায় সব পর্যটকেরই থাকে। সাফারি বন্ধে তাই উত্তরবঙ্গের জঙ্গল পর্যটন থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেন তাঁরা।

জঙ্গল পর্যটনে এই আঘাত সার্বিকভাবে উত্তরবঙ্গের পর্যটন বিকাশে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। লজ-রিসর্টের মালিক, শ্রমিক তো বটেই, জঙ্গল সাফারির গাড়ির চালক, গাইডরাও উপার্জন থেকে বঞ্চিত হবেন। এঁদের অনেকে এই পেশার ওপরই সামগ্রিকভাবে নির্ভরশীল। ফলে পর্যটন বন্ধ থাকলে লকডাউন পরবর্তী কিছুটা স্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁদের জীবনের ওপর আবার ব্যাপক আঘাত ডেকে নিয়ে আসবে, যার প্রভাব স্থানীয় অর্থনীতির ওপরও পড়বে। বন সহায়কের চাকরিতে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির পাশাপাশি এটাও এলাকায় অসন্তোষের কারণ। বন দপ্তর এই বিরোধে কার্যত অসহায়তা প্রকাশ করায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হচ্ছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাদের কোনও হাত নেই বলে বন দপ্তরের বক্তব্য।

ঘটনা যাই হোক, কিংবা কারণ যাই হোক, সমস্যাটি বাস্তব এবং এই বিরোধকে কেন্দ্র করে একটি সরকারি দপ্তরে যেমন অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তেমনই পর্যটন ব্যাহত হওয়ার বিপদ একেবারে ঘাড়ের ওপর উপস্থিত হয়েছে। ঘুরে দাঁড়ানোর মুখে এই ধাক্কা দীর্ঘস্থায়ী হলে কিন্তু পর্যটকরা আবার বিরূপ হতে পারেন। ফলশ্রুতিতে আবার চোট পাবে উত্তরবঙ্গের পর্যটন সম্ভাবনা। তেমন হলে সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি এবং লক্ষাধিক মানুষের জীবিকা সংকটে পড়বে। আর দেরি না করে প্রশাসনের উচিত সমস্যাটির সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা।

অমৃতধারা

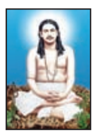

সংগীতের রাগিণী অমূর্ত, কিন্তু ভাবলোকে তারা মূর্তিমতী। এখানে কোনো রাগিণীর গান শুনলে যে আনন্দ হয়, সেখানে সে রাগিণীকে দেখলে তাই হয়। এখানে যার মূর্তি আছে, সেখানে তা অমূর্ত্ত। আর এখানে যা অমূর্ত, সেখানে তার মূর্তি আছে। ভাবলোকে দাস্য সখ্য প্রভৃতি ভাবগুলি মূর্তিমান। শিব সম্বন্ধেই ধর – নন্দি ও ভৃঙ্গি বিবেক ও বৈরাগ্য – জয়া ও বিজয়া, শান্তি প্রীতি ইত্যাদি। ভাবলোক কোনো গুণের অধীন নয়, একমাত্র প্রেমিক সেখানে যেতে পারেন। যোগ দ্বারা বা অন্য কোনো তত্ত্ব দ্বারা ভাবলোক জানা যায় না – এ লোক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বে। জগৎ রহস্য আয়ত্ত হলেও ভাবলোকের সন্ধান পাওয়া যায় না– এমনকি সমাধিস্থ যোগীও সে লোকের খবর পান না। কেবলমাত্র ভাবগ্রাহী প্রেমিক ভক্তের সে লোকে অধিকার।

–স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

শব্দরঙ্গ ■ ২৮১৪

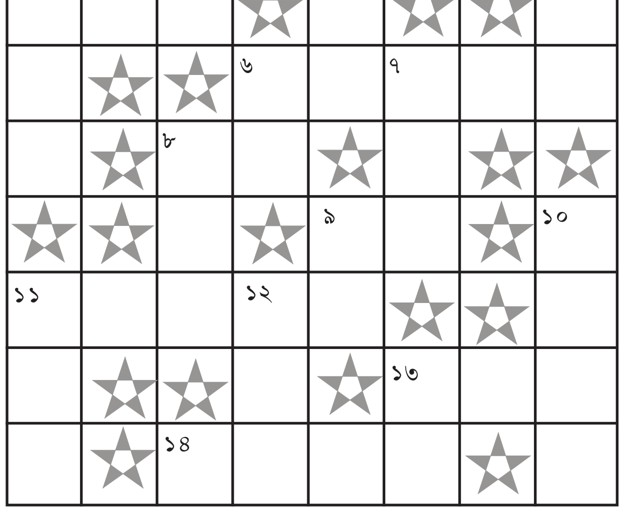

পাশাপাশি : ২। ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী ৫। অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি ৬। ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীর ভাষাবিশেষ, ত্রিপুরার সরকারি ভাষাবিশেষ ৮। ওড়িশায় একটি তীর্থক্ষেত্র, ভবন বা ঘর ৯। প্রাণত্যাগ করা, মৃত, শুকিয়ে যাওয়া ১১। তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি, ঝগড়া ১৩। চাপরাস, নিয়োগ বা পদের নিদর্শক পরিচ্ছদ, পদক ১৪। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা।

উপর-নীচ : ১। অজুহাত-এর রূপভেদ ২। গাঢ় বেগুনি রংয়ের এবং কষায় স্বাদযুক্ত ছোট ফলবিশেষ ৩। সোনা ৪। আগুন, শোধনকারী ৬। হাতি ৭। অংশ, ভাগ ৮। সংগীতের অপরাহ্নকালীন রাগিণীবিশেষ ৯। কাব্যে মণ্ডিত করা, ভূষিত করা, ছানার তৈরি সন্দেশজাতীয় মিঠাইবিশেষ ১০। খুশকি ১১। বাঁশের ফালি বা চটা ১২। হঠাৎ লাফ বা লাফের বেগসূচকভাব ১৩। পর্যন্ত, অবধি।

সমাধান ■ ২৮১৩

পাশাপাশি : ১। বনবন ৩। কার্তিক ৫। নকলনবিশ ৬। লহর ৭। লহমা ৯। অতিনাটকীয় ১২। বিহার ১৩। করতালি।

উপর-নীচ : ১। বন্দিপাল ২। নর্তক ৩। কামান ৪। কপিশ ৫। নর ৭। লয় ৮। মানকলি ৯। অটবি ১০। নাচার ১১। কীচক।

নরেন্দ্রনাথকে ত্রিদণ্ডী ধারণ করালেন ঠাকুর, উজ্জ্বল উপবীত, অদ্ভুত এক উপনয়ন

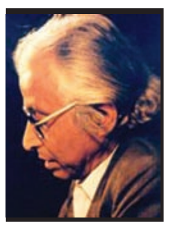

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

নরেন্দ্রনাথ চলেছেন মায়ের কাছে। যেতে যেতে কেমন একটা ঘোর লেগে গেল। একটা নেশা। জগৎ ভুল। হাসিমুখে মা, দুটি হাত তুলে অপেক্ষা করে আছেন। ধাপে ধাপে নরেন উঠে আসছেন। দুঃখের পথ মাড়িয়ে আসছেন। মা ডাকছেন, আয় আয়। হয়ে যাক শাক্তের সঙ্গে শক্তির খেলা।

ধর্মের তিনটি ব্যাপার নরেন মানতেন না।

মন জুড়ে বিরাট এক সংশয়। প্রথমত, তিনি অবতার মানতেন না। দ্বিতীয়ত, সাকার উপাসনা, মূর্তিপুজো ঘৃণার চোখে দেখতেন। তৃতীয়ত, অদ্বৈতবাদ ও নাস্তিকতা একই জিনিস– এই ছিল তাঁর ধারণা। এ তো মহাসমস্যা। সাকার দেবদেবী মানেন না। নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মও মানেন না। 'সবই ব্রহ্ম' এই কথা শুনলে ঠাট্টা করেন, 'তাহলে ঘটিটাও ব্রহ্ম, বাটিটাও ব্রহ্ম। মানুষ কেমন করে বলে, আমি ব্রহ্ম, জীব আর ব্রহ্ম অভেদ। এ তো একধরনের নাস্তিকতা। সৃষ্ট জীব নিজেকে স্রষ্টা ভাবছে। এর চেয়ে পাপ আর কী হতে পারে! মুনি-ঋষিদের মাথা খারাপ। এমন কথা লিখলেন কী করে?' এমন হাজারো প্রশ্ন নরেন্দ্রনাথের মনে।

'মাকে মানিস না– সেই জন্য তোর এত কষ্ট।'

'আমি তো মাকে জানি না।'

১৮৮৫ সালের ২ মার্চ থেকে ৭ মার্চের মধ্যে কোনও একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই কথোপকথন। নরেন্দ্রনাথ মা কালীকে মানেন না। কেন মানেন না! যদি না-ই মানেন, তাহলে মা কালীর সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি কেন যাওয়া-আসা করেন! ঠাকুরকে প্রথম যেদিন দেখলেন, সেদিন তাঁর মনে হল মানুষটি অর্ধোন্মাদ– মোনোম্যানিয়াক।

১৮৮১ সালের পৌষ মাসে নরেন্দ্রনাথ তাঁর দুই বন্ধু এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের ঘোড়ার গাড়িতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এলেন। কেন এলেন? বড়লোকের ছেলে। সবল সুগঠিত দেহ। অতি রূপবান। তেজোদৃপ্ত, সুন্দর, লাবণ্যমাখা মুখমণ্ডল। নাচ, গানবাজনা, রঙ্গরসের বিধিদত্ত প্রতিভার অধিকারী। অন্তরে প্রীতি আর পবিত্রতা। সকলের প্রিয়। মেধাবী। অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র।

কী কারণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এলেন? 'অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন ঊনবিংশবর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক।' মূর্তিপূজোয় তিনি বিশ্বাসী নন। অকারণে গদগদ ভক্তি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ভাব, ভাবালুতা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। আমি নিজে বুঝতে চাই, নিজে জানতে চাই, পরখ করে দেখতে চাই। বলা কথায় আমার বিশ্বাস নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা– যে যেখানে আছেন থাকুন। না জেনে, না চিনে ধর্ম নিয়ে যাঁরা মাতামাতি করছেন করুন। দাম্ভিক, অহংকারী। হ্যাঁ, আমি তাই। আমি একটি প্রশ্ন হাতে নিয়ে জগতে প্রবেশ করেছি। এমন কেউ আছেন কি? সত্যবাদী, যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন, প্রত্যক্ষ। শোনা কথা নয়। হোই হোথায় ঈশ্বর আছেন, সঙ্গে সঙ্গে নাচতে শুরু করলুম। বিশ মন দুধ ঢেলে এলুম বাবার মাথায়। তিলকচর্চিত চিতাবাঘটি হয়ে বসে পড়লুম আসনে। শিষ্যরা মালা পরাতে লাগল। পদসেবা ও ধর্ম যেমন আছে থাকে থাক। পুরোহিত নির্ভর। শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, সত্যনারায়ণ, ঘণ্টাবাদন, চামর ব্যাজন। মরে কেউ স্বর্গে যায়, কেউ যায় নরকে। মেয়েলি ধর্ম আমাকে আকর্ষণ করে না। আমি চিত্ত বুঝি, আমি প্রায়শ্চিত্তও বুঝি না। তবে এটি বুঝি, 'এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশি বাজাচ্ছেন।' ট্র্যাডিশন। হাজার হাজার মানুষের প্রশ্নহীন বিশ্বাসের বেদিতে ভগবানের অবস্থান। যার বিশ্বাস নেই, তার কী হবে! ওংকার ধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি, হরিনামে সর্বপাপনাশ, শরণাগতের সর্বপ্রাপ্তি– এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য, কিন্তু দেখতে পাচ্ছ যে, লাখো লোক ওংকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত 'প্রভু যা করেন' বলছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম।

নরেন যখন বালক, তখন পুরাণ শুনতে ভীষণ ভালোবাসতেন। শ্রুতিধর। রামায়ণ শুনে শুনে মুখস্থ। মেলা থেকে রাম-সীতার মূর্তি কিনে এনে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ধ্যানে বসতেন। বালকের সেই ধ্যান এমনই প্রগাঢ় হত, দরজা ভেঙে বালক বিলেকে বের করতে হত। রাম আর সীতার লীলাধ্যানে বালক মগ্ন চৈতন্য। কিন্তু যেই শুনলেন, রামচন্দ্র সীতাকে বিবাহ করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে যুগল মূর্তি ছুড়ে ফেলে দিলেন। ঘৃণার কারণ? কেউ একজন বলেছিলেন, বিয়ের মতো খারাপ কাজ আর কিছু নেই। ভগবান রাম সেই ঘৃণিত কাজ করেছেন। বালক বিলের হাতে রামচন্দ্রের দ্বিতীয়বার নিষ্ঠুর নির্বাসন। সীতা-রামের আসনে এসে বসলেন মহাদেব।

শৈশব থেকেই সন্ন্যাস সম্পর্কে তাঁর অদ্ভুত একটা রোমান্টিকতা ছিল। কারণ হয়তো এই, পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। গৌরবর্ণ সুপুরুষ দুর্গাপ্রসাদ অ্যাটর্নি অফিসে আইনজীবী ছিলেন। উত্তর কলকাতা নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের সুশিক্ষিতা ও পরমাসুন্দরী কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেছিলেন। শ্যামাসুন্দরীর গর্ভে দুটি সন্তান। প্রথমটি কন্যা। সাত বছর বয়সে মারা যায়। দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বনাথ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে এক বছরের বড়। দুর্গাপ্রসাদের বয়স তখন পঁচিশ। সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর সংসার, প্রচুর উপার্জন। কে বাজান বৈরাগ্যের বাঁশি! সব ছেড়ে নিরুদ্দেশ।

দত্ত পরিবারে সন্ন্যাসের বাতাস। এই কাহিনী পরিবারে ভেসে বেড়াত। বালকের মনে ঘটনাটি স্বপ্ন হয়ে বাসা বেঁধেছিল। সোমবার শিবের বার। সেই বারেই নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। ১৮৬৩ সাল, ১২ জানুয়ারি। সবাই দেখে বললেন, অবিকল ঠাকুরদার মতো চেহারা, দুর্গাপ্রসাদ ভুলতে পারেননি। ছেলের কাছে ফিরে এলেন। বৌমা, ছেলের নাম রাখো 'দুর্গাদাস'। বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে সন্তান লাভ। ভুবনেশ্বরী সন্তানের নাম রাখলেন 'বীরেশ্বর'। রাশ্যাশ্রিত নাম হল নরেন্দ্রনাথ। স্কুলে নরেন্দ্রনাথের ক্লাসে কোনও নতুন ছেলে ভর্তি হলে, নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নই ছিল, তার ঠাকুরদা কি সন্ন্যাসী হয়েছেন? বন্ধুদের বলতেন, 'আমি সন্ন্যাসী হব। আমার হাতে সন্ন্যাসী হওয়ার একটা বিশাল রেখা আছে। মাথায় জটা। পরনে কৌপীন। হাতে দণ্ড কমণ্ডুল। গহন অরণ্যে হাঁটছি। একা, একেবারে একা। তেষ্টা পেলে ঝরনার জল। গাছের তলায় শয়ন। আহার ফলমূল। তারপর হিমালয়ে। বরফ শুধু বরফ। বড় বড় সন্ন্যাসীরা সেখানে গুহার ভেতর ধ্যানে বসে থাকেন। কেউ তাঁদের দেখতে পায় না।

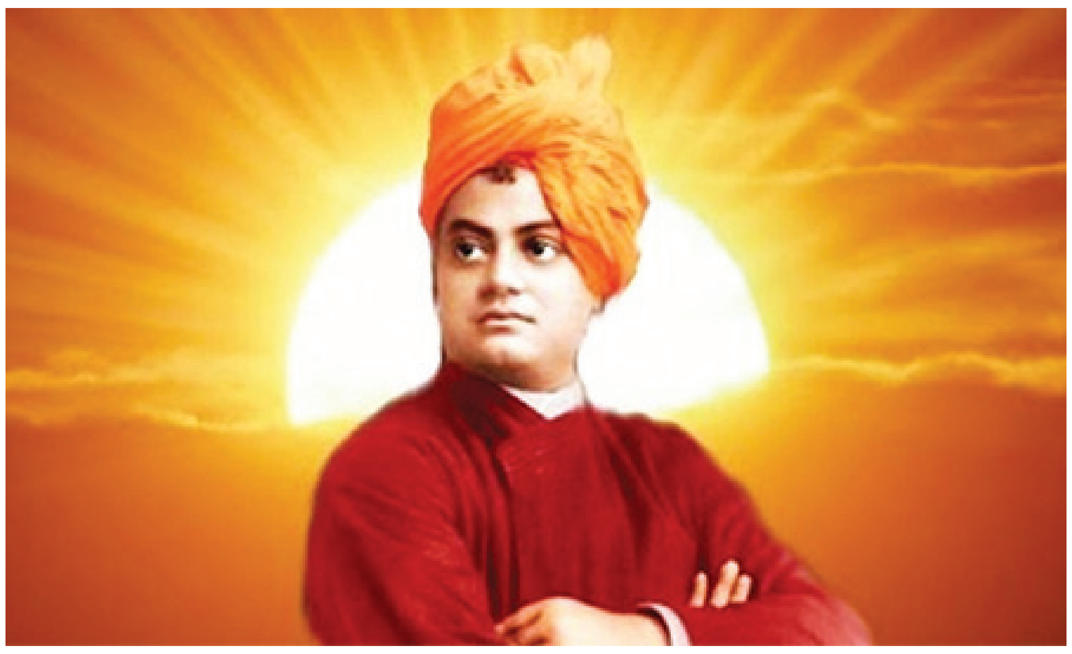

দত্ত পরিবারে সন্ন্যাসের বাতাস। সোমবার শিবের বার। সেই বারেই নরেন্দ্রনাথ পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। ১৮৬৩ সাল, ১২ জানুয়ারি। সবাই দেখে বললেন, অবিকল ঠাকুরদার মতো চেহারা। বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে সন্তান লাভ। ভুবনেশ্বরী সন্তানের নাম রাখলেন 'বীরেশ্বর'। রাশ্যাশ্রিত নাম নরেন্দ্রনাথ। স্কুলে নরেন্দ্রনাথের ক্লাসে কোনও নতুন ছেলে ভর্তি হলে নরেন্দ্রনাথের প্রশ্নই ছিল, তার ঠাকুরদা কি সন্ন্যাসী হয়েছেন? বন্ধুদের বলতেন, আমি সন্ন্যাসী হব। আমার হাতে সন্ন্যাসী হওয়ার একটা বিশাল রেখা আছে।

আমিও গুহায় থাকব। সাধনা করব। আর ফিরে আসব না।'

বালক নরেন্দ্রনাথের একটি প্রিয় খেলা ছিল, 'রাজা আর রাজসভা'। নরেন্দ্রনাথ রাজা। চণ্ডীমণ্ডপের সর্বোচ্চ ধাপে বসে আছেন। নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি, অধীনস্থ রাজারা আর অন্য কর্মচারীরা পদমর্যাদা অনুসারে সিঁড়ির বিভিন্ন ধাপে। শুরু হত দরবার, বিচারাদি রাজকার্য। রাজোচিত গাম্ভীর্যে। তিনি রাজা। বসে আছেন কল্পনার রাজ সিংহাসনে। এই রাজা, তো এই সন্ন্যাসী। কল্পনা দুই বিপরীত মেরুতে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদিন একফালি গেরুয়া কাপড় কৌপীন করে পরেছেন। সারা বাড়ি ঘুরছেন সেই বেশে। মা জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কী রে?' বীরেশ্বর সোল্লাসে বললেন, 'মা, আমি শিব হয়েছি।' এখানেই শেষ নয়। কোথাও এবার নির্জনে ধ্যানে বসবেন। ক্রমে উঠে যাবেন কোন আলোকে।

এ হেন ব্যাকুল নরেন্দ্রনাথের সেই এক প্রশ্ন–'মহাশয়, আপনি ঈশ্বরদর্শন করেছেন?' সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের দৃঢ় উত্তর, 'হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরদর্শন করেছি, ঠিক যেমন তোমাদের দেখছি। আরও ঘনিষ্ঠরূপে। ঈশ্বরদর্শন হয়, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা চলে, ঠিক যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু কে তা চায়?'

নরেন্দ্রনাথ ফিরে এলেন এই বোধ নিয়ে, উন্মাদ হলেও সত্যই একজন উঁচুদরের সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ একবারও তাঁকে বললেন না, যাও, মন্দিরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে এসো। মায়ের রহস্য আর নরেন্দ্রনাথের রহস্য তাঁর কাছে জমা রইল।

সংসারে একুশটা বছর নরেন্দ্রনাথের রাজকীয় জীবন। পিতার বিপুল উপার্জন। খাওয়াদাওয়া গানবাজনা। বিশাল পরিবার, অনেক আশ্রিত। প্রিন্সের জীবন। এফএ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ধনীর কন্যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব। ১৮৮৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি, রাত দশটা। পিতা বিশ্বনাথ হঠাৎ দেহত্যাগ করলেন। আকাশ ভেঙে পড়ল। দুঃখের এই অন্ধকারে আলো দেখাবে কে? বাতিঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরকে ধরলেন নাছোড়বান্দা, 'আপনি মাকে বলে দিন। আমাদের ভীষণ অর্থকষ্ট। অন্নকষ্ট। উপবাসে দিন যায়।'

'মাকে মানিস না যে, তাই তোর এত কষ্ট! আমি মাকে ওসব বলতে পারব না। তুই সোজা চলে যা। মাকে নিজের মুখে বল। যা চাইবি তাই পাবি... আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি, আজ রাতে কালীঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি মা তোকে তাই দেবেন।'

নরেন্দ্রনাথ চলেছেন মায়ের কাছে। যেতে যেতে কেমন একটা ঘোর লেগে গেল। একটা নেশা। জগৎ ভুল। হাসিমুখে মা, দুটি হাত তুলে অপেক্ষা করে আছেন। ধাপে ধাপে নরেন উঠে আসছেন। দুঃখের পথ মাড়িয়ে আসছেন। মা ডাকছেন, আয় আয়। হয়ে যাক শাক্তের সঙ্গে শক্তির খেলা। নরেন্দ্রনাথ প্রথম দর্শনেই বিভোর। শ্রীরামকৃষ্ণের কালী। চিন্ময়ী। প্রাণচঞ্চলা। অনন্ত প্রেম, সৌন্দর্য, করুণা। নরেন্দ্রনাথ বারবার প্রণাম করছেন, 'দাও মা দাও, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও।' উদ্ভাসিত আনন্দের পথ ধরে ফিরে এলেন ঠাকুরের কাছে।

'কি রে চেয়েছিস?' 'যাঃ, ভুলে গেছি!' 'আবার যা।' বারবার তিনবার। নরেন্দ্রনাথ এলেন গেলেন। বিষয় চাইতে পারলেন না। লাউ-কুমড়ো চাইতে লজ্জা করল। চৈতন্য ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই। এপাশে রামকৃষ্ণ-কালী ওপাশে মা কালী। তিনবার আসা-যাওয়া। ত্রিদণ্ডী। বিশ্বাসের উজ্জ্বল উপবীত। নরেন্দ্রনাথকে ধারণ করালেন ঠাকুর। অদ্ভুত এক উপনয়ন। দণ্ডধারী, গেরুয়াধারী নরেন্দ্রনাথ প্রকাশিত হবেন বিশ্বে– বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

জহুরিই জহর চেনেন। 'জানতুম পারবি না। আচ্ছা যা, তোদের ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।' ঠাকুরের সে কী হইহই আনন্দ, 'আমার নরেন কালী মেনেছে। আবার বলেছে, আমাকে মায়ের গান শিখিয়ে দাও। শিখিয়ে দিয়েছি– মা ত্বং হি তারা।'

জনমত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

অধিকার রক্ষায় নস্যশেখদের আন্দোলন

১৯৯৫ সালের মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে চতুর্দিকে যখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেন কমিশনের কাছে আপিল করে ওবিসি তালিকাভুক্ত হয়েছিল, তখন উত্তরবঙ্গের কিছু বুদ্ধিজীবী উদ্যোগ নিয়ে ১৯৯৬ সালে উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর মুসলিম সংগ্রাম সমিতি নাম দিয়ে সংগঠন গড়ে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার জন্য আপিল করে। তাতে বলা হয়, ধর্মীয় ভিত্তিতে ওবিসি নির্ধারণ হয় না, ওবিসি হয় সাব-কাস্টের উপর ভিত্তি করে। তখন সংরক্ষণের তাগিদে শুরু হয় সাব-কাস্ট নির্ণয়ের অভিযান। তৎকালীন আন্দোলনকারীরা ১৯৪০ সালের আগের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে প্রমাণ করেন, উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ আদি মুসলিম জনজাতি নস্য শেখ জনজাতির অন্তর্গত। বামফ্রন্টের সময়কালে দীর্ঘ দলিল-দস্তাবেজ ও তীব্র আন্দোলনের ফলে নস্য শেখ জনজাতি ওবিসি স্বীকৃতি লাভ করে।

২০০৭ সালে রাজ্যের মন্ত্রী আব্দুল সাত্তারের কাছে বিভিন্ন রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে তৎকালীন সংগঠন ওবিসিকে ক্যাটিগোরির ভাগে নিয়ে আসার এবং পাশাপাশি নস্য শেখদের জন্য ওবিসি সংরক্ষণ ৭ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করার আবেদন জানায়। ২০১০ সালে আবেদনের উপর ভিত্তি করে নস্য শেখ জনজাতিকে তৎকালীন রাজ্য সরকার ওবিসি 'এ' ক্যাটিগোরির অন্তর্ভুক্ত করে এবং ওবিসি সংরক্ষণ ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করে।

সেই সময় উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর মুসলিম সংগ্রাম সমিতির কিছু নেতা এনআরসি আতঙ্কে উপলব্ধি করলেন, এই জনজাতির জন্য আবারও কিছু একটা করা দরকার। সেজন্যই আগেকার আন্দোলনের নেতৃত্বের একটি অংশকে নিয়ে আন্দোলনকামী নতুন কিছু মানুষ পুনরায় ২০১৯ সালের ৩১ অগাস্ট নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদ নামে সংগঠন তৈরি করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলো জনজাতির উন্নয়নের লক্ষ্যে আলাদা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে পড়া আদি জনজাতির মধ্যে নস্য শেখ মুসলিম জনজাতির উন্নয়নের জন্য আলাদা উন্নয়ন বোর্ড এখনও গঠন হয়নি। এখন এই জনজাতি এনআরসি আতঙ্কে আতঙ্কিত।

কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি বারবার সদর্পে ঘোষণা করছে, তারা ক্ষমতায় এলে দুই কোটি মুসলিমকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার বলছেন, 'এনআরসি জরুর করেঙ্গে।' বিজেপি ক্ষমতায় আসার সময় স্লোগান দিয়েছিল, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। কিন্তু এখন তাদের কর্মকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে, সবকা সাথ মুসলিম বাদ। তাদের প্রধান শত্রু যেন মুসলমানরা। তাই মুসলমানদের যে কোনও প্রকারে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানোই মূল উদ্দেশ্য হয়ে পড়েছে।

এমতাবস্থায় মুসলিমরা রক্ষাকবচ চায়। এই উদ্দেশে নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদ চার দফা দাবিতে আন্দোলন করছে। দাবির মধ্যে রয়েছে, অবিলম্বে নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদ গঠন, নস্য শেখ মুসলিমদের ভূমিপুত্রের স্বীকৃতি, পুরোনো ভোটার লিস্ট ও জমির দলিলের প্রতিলিপি অঞ্চল অফিস পর্যায়ে পৌঁছে দিতে হবে এবং কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন চালু করতে হবে।

২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মীসভায় রাজ্য সরকারের কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান তথা নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বজলে রহমান মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে স্টেজে জায়গা পান। সেখানেই উত্তরবঙ্গের নস্য শেখদের জন্য উল্লিখিত চার দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৬ ডিসেম্বর কোচবিহার রাসমেলার ময়দানে দলীয় কর্মীসভায় নস্য শেখদের উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন বোর্ড গঠনে অনুমোদন দেওয়ার আভাস দেন।

নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে, আগামী প্রজন্মের জন্য নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের অধিকার নিশ্চিত করতে, নিজ দেশে পরবাসী হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে এবং বাঁচানোর চেষ্টায় নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদ আন্দোলনে নেমে পড়েছে। এই আন্দোলন অধিকার আদায়ের আন্দোলন।

কাওসার আলম ব্যাপারী
কোচবিহার জেলা কমিটির সহ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য
নস্য শেখ উন্নয়ন পরিষদ।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি,

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সার্কাস চালু হোক

দীর্ঘদিন ধরে সার্কাসের মতো একটি সুন্দর বিনোদন শিল্প বন্ধ রয়েছে। সেইসঙ্গে বন্ধ রয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা। সার্কাস বন্ধ করে দেওয়ার পেছনে সরকারের প্রধান যুক্তি ছিল, সার্কাসে যেসব প্রাণী দিয়ে খেলা দেখানো হয়, সেইসব প্রাণীকে ট্রেনিং করানোর সময় কর্তৃপক্ষ তাদের ওপর অত্যাচার করে, যন্ত্রণা দেয়। প্রাণীদের উপর এই অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ করার জন্যই সার্কাস বন্ধ করার পাশাপাশি হাজার হাজার পরিবারের রুজিরোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হল। অথচ সরকারের কাছে কি কোনও হিসাব আছে যে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গে প্রতি বছর সড়ক বা রেল দুর্ঘটনায় কত বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়?

দুর্ঘটনায় প্রাণীমৃত্যু প্রতিরোধে সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। এমনিতেই বনাঞ্চল কমে আসায় বন্যপ্রাণীরা আর বনে নিরাপদ নয়। ক্রমেই তারা লোকালয়মুখী হচ্ছে। ফলে বাড়ছে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যু। অথচ সার্কাস বন্ধ করে দিয়ে প্রাণীদের উপর অত্যাচার বন্ধের কী হাস্যকর প্রয়াসই না সরকার করল! সার্কাসে প্রাণীগুলি কিন্তু পেট ভরে খেতে পেত। কারণ অভুক্ত প্রাণী দিয়ে খেলা দেখানো সার্কাস কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা অসুস্থ হলে চিকিৎসা হত, শুশ্রূষা পেত। সার্কাসে পশুদের খেলা শিশুদের কাছে, এমনকি বড়দের কাছেও ছিল বিশেষ আকর্ষণের। বহু শিশু সার্কাসে গিয়ে জীবনে প্রথমবার বাঘ, সিংহ বা হাতির মতো প্রাণীর সাক্ষাৎ পেত। প্রতি বছর শীতের সময় গ্রামগঞ্জ থেকে শুরু করে ছোট-বড় শহরে সার্কাসের আগমনে মানুষজন খুব আনন্দ পেতেন। তাই সরকারের কাছে অবিলম্বে এই বিনোদন শিল্পকে ফিরিয়ে আনার অনুরোধ জানাই।

গৌতমকুমার দাশ, ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর।

আলাদা নিয়ম

কোভিড-১৯ এর জন্য কোনওরকম ধর্মীয় জমায়েত বা মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। অথচ দিব্যি রাজনৈতিক দলের সমাবেশ হচ্ছে। এই ধরনের জমায়েত কি নিয়মের আওতায় পড়ে না? সেখানে কি সংক্রমণের আশঙ্কা নেই? আমাদের চেতনার চৈতন্য কবে হবে? তা কি শুধু স্বার্থের কারণে ভূলুণ্ঠিত হবে ?

দেবাশিস গোপ
কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।